ভূপেশের কেরামতি

কেরামতিটা ভূপেশের হলেও আমাদের এ গল্পের নায়ক কিন্তু নবেন্দু। যেমন ধরুন বিয়ে বাড়ি গেছেন। আসর জুড়ে সভা আলো করে বসে রয়েছে টোপর পরা বর, সেই সন্ধ্যার অবিসংবাদিত নায়ক। কিন্তু এর পিছনে কেরামতি কার তা যদি জানতে চান তবে আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে কন্যাপক্ষের মুকুটহীন সেই মহারথীটিকে, যাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় আজকের এই শুভকার্যটি ঘটা সম্ভব হয়েছে এবং এই মুহূর্তে যিনি হয়তো বরযাত্রীদের সামাল দিতে ব্যস্ত।

পৃথিবীতে দু' ধরনের মানুষ আছে। প্রথম ধরনের লোকদের দেখে পাশ কাটানোর চেষ্টা করেন আপনি, কারণ তারা যদি একবার আপনাকে পাকড়ায় আর নিস্তার নেই। সারা দুনিয়ার যাবতীয় দুঃসংবাদ শুনিয়ে শুধু আপনার সময়ই বরবাদ করবে না, ওদের নৈরাশ্যের সংক্রমণে আপনার চোখেও বিশ্বসংসার হলদে হয়ে যাবে। এরা পৃথিবীর ভগ্নদূত। সৌভাগ্যক্রমে, সংখ্যায় কম হলেও, আর এক শ্রেণীর লোকও আছে আশা-নিরাশার ভারসাম্য বজায় রাখতে, যারা আলোর সন্তান। এদের সরল বিশ্বাস ও অটুট অপ্‌টিমিজম্‌ দেখে বিস্মিত হলেও এবং মনে মনে এদের আকাট মূর্খ বললেও এরা যে আজও সমাজে টিকে আছে এর জন্য আপনি ভগবানকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারেন না।

নবেন্দু ছেলেটি এই দ্বিতীয় দলের। অন্তত ভূপেশের সেইরকমই ধারণা ছিল এত বছর ধরে। ওর স্বাস্থ্যে ফেটে পড়া গোলাপী গাল, কানের পাশ দিয়ে নেমে আসা ভ্রমর কৃষ্ণ জুল্‌পি এবং সুগোল ও ঈষৎ ড্যাবডেবে দু'চোখের সদাপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে সবসময় নিছক ভাল থাকার আমেজ মাখানো। ভূপেশ ওর স্কুল জীবনের সহপাঠী। ভূপেশের মত অত মেধাবী না হলেও মোটামুটি ভালভাবেই পরীক্ষার সবগুলো ধাপ পেরিয়ে পাটনায় একটা ফার্মে কাজ করছে নবেন্দু। ভূপেশ মাঝে মাঝে

পাটনা গেলে দেখা হয় ওর সঙ্গে। নবেন্দু ওকে টেনে নিয়ে যায় ওর মেছুয়াটুলির ছোট ফ্ল্যাটখানায়। সেখানে ভৃত্য কালীচরণ মনিববন্ধুর পরিচর্যা করে। খাওয়াদাওয়া গল্পগুজবের পর নবেন্দু মোটরসাইকেলে ভূপেশকে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়। অথচ ভূপেশ কিন্তু কোনদিনই ওকে খুব একটা অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে গণ্য করেনি। এমন কি স্কুলে পড়ার সময়ও আড়ালে বরং হাসি তামাশাই করেছে নবেন্দুকে নিয়ে ওরা।

মাঝে বছরকয়েক দেখাসাক্ষাৎ হয়নি ওদের। সেবার অফিসের কাজে ধানবাদে গেছে ভূপেশ। একটা দোকানে প্রয়োজনীয় দু'চারটে জিনিস কিনে বেরোবার সময় একটু দূরে একটা পরিচিত মুখ দেখে থমকে দাঁড়ালো, "আরে নবেন্দু না?"

নবেন্দু আগের মত এগিয়ে এসে সজোরে পিঠ চাপড়ালো না, কিংবা ওর হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে উচ্ছ্বাসে গদগদ হয়ে উঠলো না।

শুধু ফ্যাসফেসে গলায় বললো, "কবে এলি ধানবাদে?"

ভূপেশ বিস্মিত হয়ে নবেন্দুকে খুঁটিয়ে দেখছে তখন। গাল চুপসে গর্তে ঢুকেছে, চোখের কোলে কালি, রুক্ষ বেশবাস।

"তোর কি অসুখটসুখ করেছিল নাকি?"

নবেন্দু ফ্যাকাসে হেসে বললো, "না, কিচ্ছু হয়নি।"

ওকে প্রশ্ন করে জানা গেল নবেন্দু এখন ধানবাদেই থাকে। পাটনার সেই ফার্মটা ধানবাদে নতুন একটা ব্রাঞ্চ খুলেছে, নবেন্দু তার ম্যানেজার। অর্থাৎ চাকরিতে আরও উন্নতি করেছে নবেন্দু, মাইনে বেড়েছে অনেক। কিন্তু তবে এরকম হাল কেন? অন্যবারের মত এবার আর নবেন্দু ওকে আমন্ত্রণ জানালো না। বরং ভূপেশই জেরা করে ওর ঠিকানা আদায় করলো।

"ধানবাদে দিন আষ্টেক থাকবো। তোর ওখানে যাবো একদিন ----।"

নবেন্দু শূন্য উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়েছিল।

শুকনো গলায় বললো, "আচ্ছা।"

সেইদিনই সন্ধ্যায় খুঁজে খুঁজে হীরাপুরে নবেন্দুর আস্তানায় গিয়ে হাজির হল ভূপেশ। নবেন্দু তখনও ফেরেনি। কালীচরণ ভূপেশকে

দেখে মহাখুশি। সাদরে ভিতরের ঘরে নিয়ে বসালো। চা জলখাবার ধরলো সামনে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালো। ভূপেশ ঠিকই আন্দাজ করেছিল। কালীচরণের মনে সুখ নেই। একথা সেকথার পর নিজেই ভাঙলো কথাটা। নবেন্দুর জন্যে নাকি দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তার।

"কি জানি হুজুর কি যে হয়েছে বাবুর। আজ আট বছর ধরে কাজ করছি। বাবু আমার অমন হাসিখুশি দিলদরাজ মানুষ। বছর খানেক ধরে কি যে হয়েছে ! খাওয়া নেই, ঘুম নেই। মানুষটাই পালটে গেছে একেবারে ----।"

"সেকি?"

"হ্যাঁ হুজুর। সারারাত ঘরময় পায়চারি করে বেড়ান, এক ফোঁটা ঘুম নেই। কে জানে কোন শত্তুরে কিছু গুণ করলো কিনা। এমন নিপাট ভালমানুষের কোন শত্তুর থাকতে পারে একথা মানতেও তো মন সরে না।"

"এক বছর থেকে এমন হয়েছে বলছো? তোমরা পাটনা ছেড়েছো কদ্দিন?"

"পুরো দু'বছর হয়ে গেছে। প্রথম বছরটা বেশ কাটলো, তার পরে পরেই এইরকম। পাটনায় খুব ভাল ছিলাম হুজুর। হঠাৎ একদিনের মধ্যে সব সংসার তুলে চলে আসতে হল। বাবুর নাকি অনেক উন্নতি হয়েছে চাকরিতে। কি লাভ হল তাতে? মানুষের মনে সুখই যদি না রইলো তবে ঝাঁটা মারি অমন উন্নতির মুখে ----।"

কালীচরণের অনুরোধে রাত্রে ওখানেই খেতে রাজি হতে হল ভূপেশকে। তাছাড়া নবেন্দু সম্বন্ধে কৌতূহল এবং দুশ্চিন্তাও প্রবল হয়ে উঠেছিল মনে। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার ইচ্ছেটা চাপতে পারলো না ভূপেশ। নবেন্দু ফিরলো বেশ রাত করে। সেই উদাস উসকো-খুসকো চেহারা, দু'চোখে শূন্য হতাশ দৃষ্টি। ওদের খাওয়াদাওয়া শেষ হতে হতে রাত এগারোটা বাজলো।

ভূপেশ ওঠার নাম করতে কালীচরণ মনিবের দিকে চেয়ে কুন্ঠিত স্বরে বললো, "এত রাতে বাবু কোথায় যাবেন। ও ঘরে বিছানা পেতে দিই।"

নবেন্দু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, "তাইতো, অনেক রাত হয়ে গেছে। আজ এখানেই থেকে যা।"

সারাদিন যথেষ্ট পরিশ্রম গেছে। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো ভূপেশ। মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাশের ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে কেউ। যেন কোনও বদ্ধ জন্তু ছটফট করছে খাঁচার মধ্যে। ভূপেশ ঘড়ি দেখলো। আড়াইটে বেজে গেছে ----।

পরদিন। রুবী রোডে হলদে একতলা একটা বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়লো ভূপেশ।

বাইশ তেইশ বছরের একটি মেয়ে দরজা খুলে হাসিমুখে বললো, "কবে এলে ভূপেশদা?"

"কাল। মাসিমা কোথায়?"

মেয়েটির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, "ঠাকুর ঘরে।"

"এই অবেলায় ঠাকুরঘরে? তার মানে মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া হয়েছে আবার।"

কৃষ্ণা বললো, "সত্যি ভূপেশদা, মা এমন অবুঝ ! মার ধারণা ওর কালোকুচ্ছিৎ মেয়ের জন্যে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্তুর এই এলো বলে। বাবা গেছেন আজ চার বছর। চার বছর ধরে বিয়ের চেষ্টা হয়েছে এন্‌তার। কিছুতেই হার মানবে না মা। এদিকে বয়স তো বসে নেই। তাছাড়া আমাদের সংসারের অবস্থা তো জানই। সামান্য কিছু সঞ্চয় ছিল তাই ভাঙিয়ে কতদিন চলবে? কাগজে নার্সিং ট্রেনিং-এর জন্যে দরখাস্ত চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। আমি নাম পাঠিয়েছি, তাইতেই মা কান্নাকাটি শুরু করেছে। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো মাকে। পৃথিবীতে চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে বিরাট ফাঁক। তাই বলে যা চাই তা পেলাম না বলে যেটুকু পেতে পারি সেটুকু কেন দূরে ঠেলবো? ভাগ্যের উপর অভিমান করে কি লাভ হবে বলো? মা কিছুতেই বুঝতে চায় না।"

"কবে থেকে ট্রেনিং শুরু?"

"দু'মাস পর থেকে।"

ভূপেশের গলা পেয়ে সুরবালাদেবী পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কৃষ্ণা রান্নাঘরে গিয়ে পরোটার আটা মাখতে বসলো। মা যে গলা নামিয়ে ওর কথাই আলোচনা করছে সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হল না ওর। খানিক পরে কাঁসার থালায় পরোটা আর আলু-ছেঁচকি এবং এক গ্লাস জল নিয়ে

ভূপেশের সামনে রাখলো কৃষ্ণা।

সুরবালাদেবী বললেন, "ওটুকু খেয়ে নাও বাবা।"

ভূপেশ খেতে খেতে বললো, "বুঝলে কৃষ্ণা, মাসিমার সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে। রাঙা টুকটুকে রাজপুত্তুরকে আমরা আর মাত্র দু'মাস সময় দেবো। এর মধ্যে পক্ষীরাজ যদি তাকে আমাদের দরজায় হাজির করতে পারে তো ঠিক আছে। তা না হলে আমাদের মেয়ে তাকে কলা দেখিয়ে নার্সিং কেরিয়ারকেই বরণ করে নেবে।"

সুরবালাদেবী অপ্রসন্ন মুখে মেয়ের দিকে দেখলেন।

কৃষ্ণা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হেসে বললো, "তুমি কিন্তু সাক্ষী রইলে ভূপেশদা। তখন কোনও কান্নাকাটি শুনতে চাই না আমি।"

ভূপেশ গম্ভীর মুখে বললো, "দু'মাসের মধ্যে বিয়ে ঠিক না হলে তুমি অনায়াসে ট্রেনিং জয়েন করতে পারো। আমরা বাধা দেবো না। তবে এর মধ্যে যদি সম্বন্ধ জোগাড় হয়ে যায় তখন কিন্তু তোমাকে নার্সিং-এর কথা ভুলে যেতে হবে।"

কৃষ্ণা বললো, "তথাস্তু।"

রবিবার ভোরবেলা নবেন্দুর ফ্ল্যাটের দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

সেই সঙ্গে ভূপেশের গলা শোনা গেল, "নবেন্দু আছিস নাকি? ও কালীচরণ দরজা খোলো। "

কালীচরণ হিটারে চায়ের কেটলি বসাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলো।

"বাবু উঠেছে?"

নবেন্দু ডোরাকাটা পাজামা পড়ে বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বললো, "এই যে আয়।"

ওর দু'চোখে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি। উসকো-খুসকো চুল, একরাতের দাড়ি ও লালচে চোখের উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি - সবকিছু মিলিয়ে কেমন একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব। সে সব খেয়াল না করার ভান করে ভূপেশ অন্তরঙ্গ সুরে একনাগাড়ে বকে চললো সমানে।

চা জলখাবার খেয়ে ব্যালকনিতে বেতের চেয়ার টেনে বসলো দুজনে। কালীচরণকে ডেকে ভূপেশ নিজের থেকেই বললো যে ও আজ ছুটির দিনটা এখানেই কাটাবে। ওর জন্যেও যেন ভাতের চাল নেয় কালীচরণ। সংসার না করেও সাংসারিক অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ভূপেশের। ওর ওষুধে ফল ধরলো শেষে। দুপুর নাগাদ নবেন্দুর স্তব্ধতার প্রাকারে ফাটল দেখা দিলো। ভূপেশ শুধু নীরবে শুনে গেল। চোখে মুখে কৌতুক বা বিস্ময়ের কোনরকম অভিব্যক্তি না ফুটিয়ে।

পাটনার চাকরিটা বিনা সুপারিশেই পেয়েছিল নবেন্দু। চাকরিটা ওর কাছে আশাতীত ভাল মনে হয়েছিল। অন্যেরাও এর বেশী ওর কাছে আশা করেনি কোনদিন। শুধু মাইনেপত্তরই নয় অফিসটাও প্রথম দিনই ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছিল, যেমন ভাল লেগেছিল বড়সাহেবের সেক্রেটারী রোজিকে। তার কাঁধ অবধি ঢেউ খেলানো বাদামী চুল, ফর্সা ছিপছিপে চেহারা, মিষ্টি লাজুক হাসি আর সংযত বেশবাস - সব মিলিয়ে নবেন্দুকে কাছে টেনেছিল অচিরেই। রোজি মেয়েটি সত্যিই একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এই শ্রেণীর মেয়েদের সম্বন্ধে নবেন্দুর ধারণার সঙ্গে এতটুকু মিল নেই। কেমন একটা শান্ত মর্যাদার আভা যেন সর্বদা ঘিরে আছে তাকে। রোজি শুধু নবেন্দুকেই মুগ্ধ করেনি। বড় সাহেব খুরানাও গত দু'বছর যাবৎ মুগ্ধ স্তাবক ওর।

খুরানার বয়স চল্লিশের কোঠায়। স্ত্রী গত হয়েছেন, একমাত্র ছেলে দেরাদুনের বোর্ডিং-এ। দুনিয়ার হালচাল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল লোক। তবু রোজি-মেয়েটাকে কিছুতেই কায়দায় আনতে পারছে না। ওর সমস্ত ফন্দি-ফিকির রোজির ঘরোয়া সারল্যের বর্মে ঠোকর খেয়ে ফিরে আসে ব্যর্থ হয়ে। ক্রমে রোখ চেপে গেছে খুরানার। এখন আর রোজিকে দু'চারটে রঙিন সন্ধ্যার লীলাসঙ্গিনী হিসেবে নয়, পাকাপাকিভাবে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেতে বদ্ধপরিকর সে। নবেন্দু ছোকরার প্রতি রোজির পক্ষপাতিত্ব খুরানার দৃষ্টি এড়ায়নি। প্রথমে ব্যাপারটায় শুধু হালকা কৌতুকেরই ছোঁয়া পেয়েছিল সে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন দেখলো নবেন্দুর বেলায় রোজি অনায়াসে তার এতদিনকার বাধানিষেধের গণ্ডী পেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে কোন সাবধানতা সতর্কতার তোয়াক্কা না করে, এবং নবেন্দুর হাবভাবেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যার অর্থ খুরানার মত সংসার-চষেফেলা লোকের কাছে জলের মত পরিষ্কার, খুরানা রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে

উঠলো।

সত্যিই নবেন্দু আর রোজি তখন ঘর বাঁধার স্বপ্নে মশগুল। এরকমটা হবে কোনদিন ভাবেনি নবেন্দু। ভাবেনি রোজিও। বহু লোকের ভিড়ের মাঝে হঠাৎ পরিচয়ের আলো খেলে গেল দু'জোড়া চোখে। মন বললো, "এই তো সে।" সব সংশয় ঘুচে গেল সেই প্রথম পরিচয়ের চরম মুহূর্তে।

তারপর আরও বছর খানেক কেটে গেছে। সামনের সপ্তাহে বিয়ে করছে ওরা। নবেন্দু গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে। সে জানে বাবা-মাকে বুঝিয়ে মত করানোর আশা বৃথা। তার চেয়ে একেবারে বউ নিয়ে হাজির হবে দেশের বাড়িতে। দুজনে প্রণাম করে দাঁড়াবে নতমুখে। তারপর যা হ'বার হোক। বিয়েটা একবার হয়ে গেলে আর তাকে নাকচ করতে পারবে না কেউ। রেজিস্ট্রি করে বিয়ে। কাজেই ধুমধাম বিশেষ হবে না। অফিসের সহকর্মীদের দু'চারজনকে বলেছে শুধু। রাত্রে একটু খাওয়াদাওয়ার আয়োজনও থাকবে। রোজি দু'দিনের ছুটিতে দানাপুরে গেছে ওর মা-বাবার কাছে। ওদের বাড়ি থেকে আপত্তি ওঠেনি। ওরা সবাই আসবে বিয়েতে। খুশি মনেই বিয়ের যোগাড়যন্তর করছে রোজির মা।

বুধবার বিয়ে। সোমবার সকালে চিঠিটা পেলো নবেন্দু। চিঠিটা ইংরিজীতে। টাইপ করা কয়েকটা লাইন শুধু। প্রেরকের নাম নেই। মর্ম এই - রোজির সারা গায়ে শ্বেতি। সেইজন্যই কনুই ঢাকা ব্লাউজ পরে, লুটোনো শাড়ি। ওকে কোনদিন স্কার্ট বা ফ্রক পরতে দেখেনি কেউ, যা নাকি ওদের সমাজের প্রচলিত পোশাক। নবেন্দুকে হাঁদারাম পেয়ে খুঁতো মেয়েটা ওর গলায় ঝুলে পড়ার মতলব ফেঁদেছে। নবেন্দু সত্যিই যদি একটা আকাট গর্দভ না হয় এবং সারাজীবন নিজের গালে চড় মেরে কাটাতে না চায় এখনও কেটে পড়ার সময় আছে।

চিঠি পড়ে বজ্রাহতের মত বসে রইলো নবেন্দু, সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে। গত এক বছর ধরে রোজিকে ভলবেসে থাকলেও দৈহিক অর্থে কোনদিন অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেনি সে। শালীনতায় বেধেছে। চিঠিটা যদি সত্যি হয় ! রোজির প্রতি ওর ভালবাসা এতই গভীর যে চিঠির

কথা সত্যি হলেও কিছু এসে যায় না একথা হলপ করে বলতে পারলো না নবেন্দু। বরং উলটোটাই বেশী সত্যি বলে মনে হল তার। বিশেষ করে রোজির সবকিছু চেপে গিয়ে বিয়ে ব্যাপারে এগোনোর কথা ভাবতেই ওর প্রেমের ভিত্তিমূলে অগুনতি ফাটল যেন নিজের মনশ্চক্ষে দেখতে পেলো নবেন্দু।

সারাদিন অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে বিকেল বেলা বাড়ির থেকে বেরিয়ে এলো সে। রাস্তার মোড়ের পাবলিক টেলিফোন থেকে খুরানার নম্বর ডায়াল করলো। লাইনের ওপাশ থেকে খুরানার কন্ঠ ভেসে এলো।

নবেন্দু বললো, "স্যার আমি নবেন্দু ভট্টাচার্য বলছি। এক্ষুনি বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছি স্যার, আমার মায়ের খুব অসুখ। আমায় যেতে হবে স্যার।"

খুরানার কন্ঠে সমবেদনা ঝরে পড়লো, "আই অ্যাম সো ভেরি সরি। কোথায় থাকেন উনি?"

"ধানবাদের কাছে একটা গ্রামে স্যার।"

"এক কাজ করুন আপনি। এক মাসের ছুটির একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিন। কাল আমি অফিসে গিয়ে স্যাংশন করে দেবো। আপনি আজই রওনা হয়ে যান। ---- আর একটা কথা। আমরা ধানবাদে আমাদের ফার্মের একটা ব্রাঞ্চ খুলছি। তার জন্যে একজন অনেস্ট, হার্ডওয়ার্কিং লোক চাই। আপনার কাজে খুবই ইমপ্রেস্ড্ হয়েছি আমি। আপনি যদি ইন্টারেস্টেড্ হন আপনাকে ওখানে অ্যাবসর্ব করার ব্যবস্থা করতে পারি। আপনার বাড়ি থেকেও কাছে হবে।

নবেন্দু গদগদ স্বরে বললো, "অনেক ধন্যবাদ স্যার। ওখানে কাজ পেলে ভীষণ উপকার হয় আমার। স্যার ইউ আর সো কাইণ্ড ----।"

"আরে না না। বলেছি তো আপনার কাজে আমি খুব সন্তুষ্ট। আমরা সব সময় ডিসার্ভিং লোকদের বেটার অপরচুনিটি দিতে চাই। তাছাড়া ওল্ড এজে পেরেন্ট্স্দের দেখাশোনা করা আমাদের সেক্রেড্ ডিউটি।"

সেই রাত্রেই ধানবাদের ট্রেন ধরলো নবেন্দু। ধানবাদ থেকে বাসে করে গ্রাম। বাবা মা তো অবাক ওকে দেখে !

"কি ব্যাপার, হঠাৎ এলি যে?"

নবেন্দু বললো, "এমনি। শরীরটা ভাল লাগছিল না। ছুটি বাকি পড়ে ছিল। ভাবলাম মাসখানেক বিশ্রাম নিই।"

"তা বেশ করেছিস।"

কিছুদিন পরে নতুন চাকরির কাগজপত্তর এলো খুরানার কাছ থেকে। ধানবাদের নতুন ব্রাঞ্চের ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছে সে। মাইনে ছ'শো থেকে এক লাফে বারোশো। নবেন্দুদের বাড়িতে খুশির বন্যা বয়ে গেল যেন।

ধানবাদের নতুন অফিসে যোগ দিলো নবেন্দু। অফিসের কাছেই একটা বাড়ির একাংশ ভাড়া নিলো। সঙ্গে চিরপুরাতন কালীচরণ। কার্যোপলক্ষে পাটনার অফিস থেকে কেউ কেউ ধানবাদ যেতো কখনো-সখনো। তাদেরই কাছে খবর পেলো রোজি এখন নাকি মিসেস খুরানা হয়েছে। জাঁকজমক ঠাটবাটে চেনাই যায় না আর। একেবারে রাতারাতি পাল্টে গেছে মেয়েটা। খবরটা শুনে নবেন্দুর মনে ঠিক কি ভাবান্তর হয়েছিল ভাল করে মনে পড়ে না আজ। কিছুটা নিরাশা, কিছুটা স্বস্তি, হয়তো বা কিছুটা ক্ষোভ। তবে বেশীক্ষণ সে ভাবটা থাকেনি তার। ধানবাদের অফিসে তখন পাহাড়প্রমাণ কাজ জমে আছে। কাজের নেশায় অন্য কিছু ভাবার ফুরসৎ পায়নি নবেন্দু।

প্রায় বছর খানেক কেটে গেল। নবেন্দু ও রোজির বিয়েটা শেষমুহূর্তে কেন যে ভেঙে গেল এ নিয়ে পাটনার বন্ধুমহলে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। পাটনা ছাড়ার পর আর ওখানে আসেনি নবেন্দু। তবে ওর যে দু'চারজন সহকর্মীর সঙ্গে ধানবাদে দেখা হয়েছে তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গ একজনকে কারণটা বলেছিল সে। ও চায়নি কথাটা আর ছড়াক। কিন্তু কথাটা চাপা থাকেনি।

এর কিছুদিন পরে একদিন অফিসে বসে ক'টা দরকারী ফাইল দেখছে নবেন্দু। ফোন বেজে উঠলো।

"হ্যালো?"

ওপাশে পরিচিত কন্ঠ শোনা গেল, "হ্যালো, আমি মিসেস খুরানা

বলছি। মিসেস রোজি খুরানা। আমি জুবিলি হোটেলে আছি। রুম নাম্বার নাইনে। আজ সন্ধ্যা সাতটায় এখানে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। বাই।"

খানিকক্ষণ স্তম্ভিত, হতভম্ভ হয়ে বসে রইলো নবেন্দু। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। সাতপাঁচ ভেবে শেষ অবধি রোজির কাছে যাওয়াই ঠিক করলো।

হোটেলে পৌঁছে রিসেপশনে নাম জানাতেই রিসেপ্শনিস্ট্ টেলিফোন তুলে নিলো।

তারপর রিসিভার নামিয়ে বললো, "মিসেস খুরানা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। সেকেণ্ড ফ্লোর, রুম নাম্বার নাইন।"

হাত নেড়ে লিফ্ট্ দেখিয়ে দিলো। রুম নাম্বার নাইনের সামনে এসে একটু ইতস্তত করছিল নবেন্দু। দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালো রোজি।

"ভিতরে এসো।"

এই এক বছরে অনেক বদলে গেছে রোজি। সামান্য একটু মোটা হয়েছে। দামী রঙচঙে শাড়ি পরনে, জড়োয়া গয়না। মাথায় বিরাট খোঁপা। ভারিক্কী হাবভাব। নবেন্দুকে বসতে ঈঙ্গিত করে ফোনে খাবারের অর্ডার দিয়ে একটু দূরে সোফার একপাশে বসলো। কেমন একটা অন্যমনস্ক ভাব। মাঝে মাঝে কপালে ভ্রূকুটি রেখা ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ছাড়া ছাড়া কথাবার্তা বলতে লাগলো ওরা। আগেকার সেই আন্তরিকতার ছিটেফোঁটাও বাকি নেই আর।

বেয়ারা ট্রে বোঝাই খাবার ও পানীয় দিয়ে গেল। নিপুন হাতে বোতলের ছিপি খুলে গ্লাসে ঢাললো রোজি। নবেন্দুর দিকে এগিয়ে দিলো। নবেন্দু প্যাটিসে কামড় দিয়েছে তখন। বিষম খেয়ে কাশির মাঝে হাত নেড়ে ইশারায় জানালো চাই না। রোজি বাঁকা হাসি হেসে জিনের গ্লাস নিজের দিকে সরিয়ে এনে তার বদলে নবেন্দুকে স্ট্র গোঁজা এক বোতল কোকাকোলা এগিয়ে দিলো। নবেন্দু আড়চোখে রোজির মদ্যপান দেখতে লাগলো। মনে একরাশ আড়ষ্টতা, শঙ্কা ও বিস্ময়ের বোঝা নিয়ে।

কয়েক গ্লাস খাওয়ার পর উঠে দাঁড়ালো রোজি। রেকর্ড প্লেয়ারে একটা রেকর্ড চালিয়ে দিলো। বিদেশী বাজনার মূর্ছনায় ঘর ভরে গেল।

"নাচবে?"

এবার খালি মুখেই বিষম খেলো নবেন্দু।

চোখ মুখ লাল করে হাত নেড়ে জানালো, "না।"

রোজি কিছু বললো না। আস্তে আস্তে ঘরের ওপাশে ফাঁকা দিকটায় গিয়ে দাঁড়ালো। বাজনার তালে তালে ওর দেহটা দুলে উঠলো। একদৃষ্টে ওর পানে চেয়ে আছে নবেন্দু। একমনে নেচে চলেছে রোজি। ক্রমশ দ্রুততর লয়ে। ওর খোঁপা ভেঙে একপিঠ চুলের তরঙ্গ উচ্ছল হয়ে উঠেছে। শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। একটানে ভারী কাঞ্জিভরম শাড়িটা খুলে সোফার উপর ছুঁড়ে দিলো রোজি। তালভঙ্গ না করে। উত্তাল হয়ে উঠলো বাজনার গতি। নাচেরও। সোফার উপর জড়ো হতে লাগলো নিক্ষিপ্ত অন্তর্বাসগুলো। হাত বাড়িয়ে জোরালো আলোটা নিভিয়ে দিলো। নরম আলোয় আশ্চর্য পিচ্ছিল, মসৃন দেখাচ্ছে রোজির নিরাবরণ নিখুঁত পেলব শরীরটা। শুধু জড়োয়া গয়নাগুলো জ্বলজ্বল করছে ওর নগ্ন দেহকে খচিত করে।

হঠাৎ বিছানা থেকে হাউসকোটটা তুলে নিলো রোজি। সেটা জড়িয়ে নিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালালো।

তারপর দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে বললো, "বেরিয়ে যাও এখান থেকে ! আই সে গেট আউট।"

নবেন্দু তো অবাক !

রোজি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "শুনতে পাচ্ছো? এক্ষুনি চলে যাও আমার সামনে থেকে নইলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবো আমি।"

নবেন্দু তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললো, "ঠিক আছে আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।"

দরজা দিয়ে বেরোনোর সময় শুনলো রোজি তখনও চাপা গলায় ফুঁসছে, "কাওয়ার্ড! ইমবেসাইল! ফুল! আমার নাকি শ্বেতি আছে। শ্বেতি! মাই ফুট্!"

হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি পৌঁছলো যখন তখন রাত গভীর হয়ে এসেছে। কালীচরণ দরজা খুলে দিলো। টেবিলে খাবার

সাজানো রয়েছে। সেদিকে দৃকপাত না করে সোজা শোবার ঘরে চলে এলো নবেন্দু। লজ্জা ও ক্ষোভে সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করছে তার। উঃ শেষ পর্যন্ত রোজি কিনা এমন করে অপমান করলো ওকে! উড়ো চিঠিটায় যা লেখা ছিল তা নির্জলা মিথ্যে - চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে গেছে আজ। কাজেই রোজির কাছে সত্যিই অপরাধী নবেন্দু। কিন্তু তাই বলে একটা বাঙালী ভদ্রঘরের ছেলেকে এমন অপদস্থ করলো, এমন ভাবে জুতো মারলো মেয়েটা! যাক্ যা হবার হয়েছে। চরম শিক্ষা হয়ে গেছে নবেন্দুর। এখন আর গতস্য শোচনা করে লাভ নেই। শুধু হুঁশিয়ার থাকতে হবে আর যেন কখনো এমন না হয়।

জামাকাপড় পালটে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লো নবেন্দু। মন থেকে অপ্রিয় ঘটনাগুলো ঝেড়ে ফেলে ঘুমোনোর চেষ্টায় চোখ বুঁজলো এবং অচিরেই ঘুমিয়ে পড়লো। তবে বেশীক্ষণ নয়। ঘুমের মধ্যে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠলো এক নৃত্যরতা নারীর ছবি। অনুজ্জ্বল আলোয় সে কি মোহময়ী রূপ তার ! বিদেশী বাজনার তালে তালে দেহে যেন রূপের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। এক এক করে সরে যাচ্ছে সব কটি আবরণ। মাখনের মত চিক্কণ পেলব দেহে শুধু খানকয় অলঙ্কার জ্বলজ্বল করছে।

ঘুম ভেঙে গেল নবেন্দুর। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। বাকি রাতটা ঘরময় পায়চারি করে কাটলো তার। এক বছর আগের ঘটনা এটা। গত এক বছর ধরে প্রতি রাতে ঘটে গেছে তারই পুনরাবৃত্তি। দেয়ালের দিকে চোখ রেখে কাহিনী শেষ করলো নবেন্দু। ওর ঝুলে পড়া থুতনি ও কালি পড়া চোখের দিকে চেয়ে মায়া হল ভূপেশের।

বললো, "সত্যি ভেরী স্যাড্। কিন্তু এ নিয়ে তুই আর মন খারাপ করিস না। মিসেস খুরানাকে আর ফিরে পাওয়া হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু দেশে আরও তো সুন্দরী মেয়ে আছে। তোর আপত্তি না থাকলে আমি ঠিক ওমনি ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম মেয়ে যোগাড় করে দেবো। তার মধ্যেই মিসেস খুরানাকে পাবি তুই।"

নবেন্দু আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠলো, "না না ভাই, আমি আর ওকে চাই না। এমন কি ওর মত দেখতে অন্য কাউকেও চাই না আমি। ওকে আমি একেবারে মন থেকে মুছে ফেলতে চাই। একদম ভুলে যেতে চাই

ওসব কথা ----।"

পকেট থেকে লাল-নীল চেক-কাটা রুমাল বার করে কপাল ও ঘাড় মুছলো নবেন্দু। তারপর ব্যাজার মুখ করে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলো আবার।

ভূপেশ চিন্তিতস্বরে বললে, "হুম্। তার মানে ফর্সা হলে চলবে না। স্লিম হবে না। বেশী সুন্দরীও হবে না ----। ইশ্ যদি মাসতিনেক আগে জানাতিস ! আমার নিজের পিসতুতো বোন ছিল। ডার্ক, মাথায় একটু খাটো, একটু মোটার ধাত। হাজারীবাগের মুখুজ্জেদের নাম শুনেছিস তো? ও তল্লাটের ডাকসাইটে বড়লোক। তাদের ছেলে ক্যানাডা থেকে ডাক্তারী পাস করে ফিরেছে। ও দেশের কোন মেমসাহেবের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে নার্ভাস ব্রেকডাউন হবার যোগাড়। সবাই বললো এর একমাত্র দাওয়াই হল বিয়ে। একে অমন বনেদী পরিবার তায় বিলেত-ফেরত পাত্র। বাছা বাছা সুন্দরী পাত্রীদের কাছ থেকে সম্বন্ধ আসতে লাগলো। কিন্তু এলে হবে কি ছেলের গোঁ তার কালোরঙের কনে চাই, ক্যানেডিয়ান সুন্দরীর সঙ্গে যার কিছুমাত্র মিল নেই।

"আমার পিসতুতো বোনের রংটা ময়লা। তাছাড়া উপরের পাটির দাঁতগুলো একটু উঁচু হওয়ায় সম্বন্ধ টিকছিল না একটাও। আসলে সবই ভাগ্যের লিখন, বুঝলি। মেয়ে দেখতে এসে ক্যানাডা-ফেরত পাত্র কেবলই উসখুস করছে। সবাই ভাবছে বুঝি অসন্তুষ্ট হয়েছে। হঠাৎ বাবাকে ডেকে বারান্দায় নিয়ে গেল। নীচুগলায় কি কথা হল খানিকক্ষণ। বাপ ঘরে ঢুকে বললেন, ছেলে বলছে এই মেয়েকেই বিয়ে করবে, আজই পাকা কথা হয়ে যাক।

"নিন্দুকের মুখে চুনকালি দিয়ে সেই কালো, দাঁতউঁচু মেয়েই রাজরানী হল শেষে। তবে কালো হলে কি হয়, ভারী চমৎকার মেয়ে। ভারী পয়া। যারা সমঝদার তারাই রত্ন চেনে। বাইরের চটক দেখে ভোলে না ----।"

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নবেন্দুর পিঠে সস্নেহে একটা চাপড় মেরে বললো, "তুই নিশ্চিন্ত থাক্। আমাকে যখন ভরসা করে সব কথা খুলে বলেছিস এর একটা বিহিত আমি করবোই। এবং যথাশীগ্গির সম্ভব। তোর শরীর আর মনের যা অবস্থা দেখছি ---।"

নবেন্দুর প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বাক্যটা অসমাপ্তই রেখে দেয় ভূপেশ, অলুক্ষুণে কথাটা শোনায় না তাকে। তবে নবেন্দু কি আর বোঝে না? সে খুব বোঝে যে এইভাবে আর কিছুদিন চললে তার কপালে এই শোবার ঘরের সিলিং থেকে ঝুলে পড়ার একমাত্র গত্যান্তর হবে রাঁচীর পাগলা গারদ।

সুরবালা গরদের থান পরে ব্যস্তভাবে ঘুরছেন। সারা মুখে প্রসন্নতার আলো ঝলমল করছে। ঘরের এক কোণে লাল চেলি পরে মাথা নীচু করে বসে আছে কৃষ্ণা। ওকে ঘিরে রয়েছে পাড়ার ক'টি মেয়ে বউ। কেউ চন্দন ঘষছে, কেউ মালা গাঁথছে, কেউ বা কথার খৈ ফোটাচ্ছে শুধু। বিকেলে গাড়িতে চড়ে টোপর পরা বরের সঙ্গে এলো ভূপেশ।

প্রতিবেশিনীরা সমস্বরে বলে উঠলো, "ওমা এ যে একেবারে কার্তিকের মত বর গো! ওরে কৃষ্ণা, তোর কপালখানা তো খুব!"

সত্যিই এই কালো মেয়েটার যে অমন বড় চাকুরে, সুদর্শন বর জুটবে এবং তাও একেবারে নিখরচায় এ যেন বিশ্বাস হ'তে চায় না কারও। সুরবালা আঁচল দিয়ে বারে বারে আনন্দের অশ্রু মোছেন।

আড়ম্বরহীন ভাবে বিয়ে সমাধা হল। বর কনে নিয়ে ফিরে যাবে এবার। সুরবালা আড়ালে ভূপেশকে বুকে টেনে নিলেন, "আর জন্মে তুমি আমার পেটের ছেলে ছিলে বাবা। তা না হলে আজকের যুগে সহায়হীন বিধবার এতবড় উপকার কেউ করে? আত্মীয়স্বজনরা কেউ ফিরেও দেখলো না কোনদিন। আর তুমি ---- " কান্নায় গলা বুঁজে এলো তাঁর।

কৃষ্ণা ভূপেশের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে প্রণাম করতে এলে ওকে হাত ধরে ওঠালো ভূপেশ।

তারপর ওর একটা হাত নবেন্দুর হাতের উপর রেখে বললো, "ভাই নবেন্দু, বাইরের রঙ রূপটাই জীবনে সবকিছু নয়। বোনটি আমার ভারী লক্ষ্মী। ওকে যদি চিনে নিতে পারো তোমার সমস্ত জীবন মাধুর্যে ভরিয়ে দেবে ও।"

তারপর কৃষ্ণার পিঠে হাত রেখে বললো, "যে যত্নটা অনাত্মীয় অসংখ্য লোকের মাঝে বিলিয়ে দিতে যাচ্ছিলে সেই যত্ন ও সেবা দিয়ে

ঘিরে রেখো একে। প্রার্থনা করি তোমাদের সংসার স্বর্গ হয়ে উঠুক।"

কৃষ্ণার ঘর্মাক্ত, ভীরু হাতটাকে ঘিরে নবেন্দু ধীরে ধীরে মুঠি বন্ধ করলো।